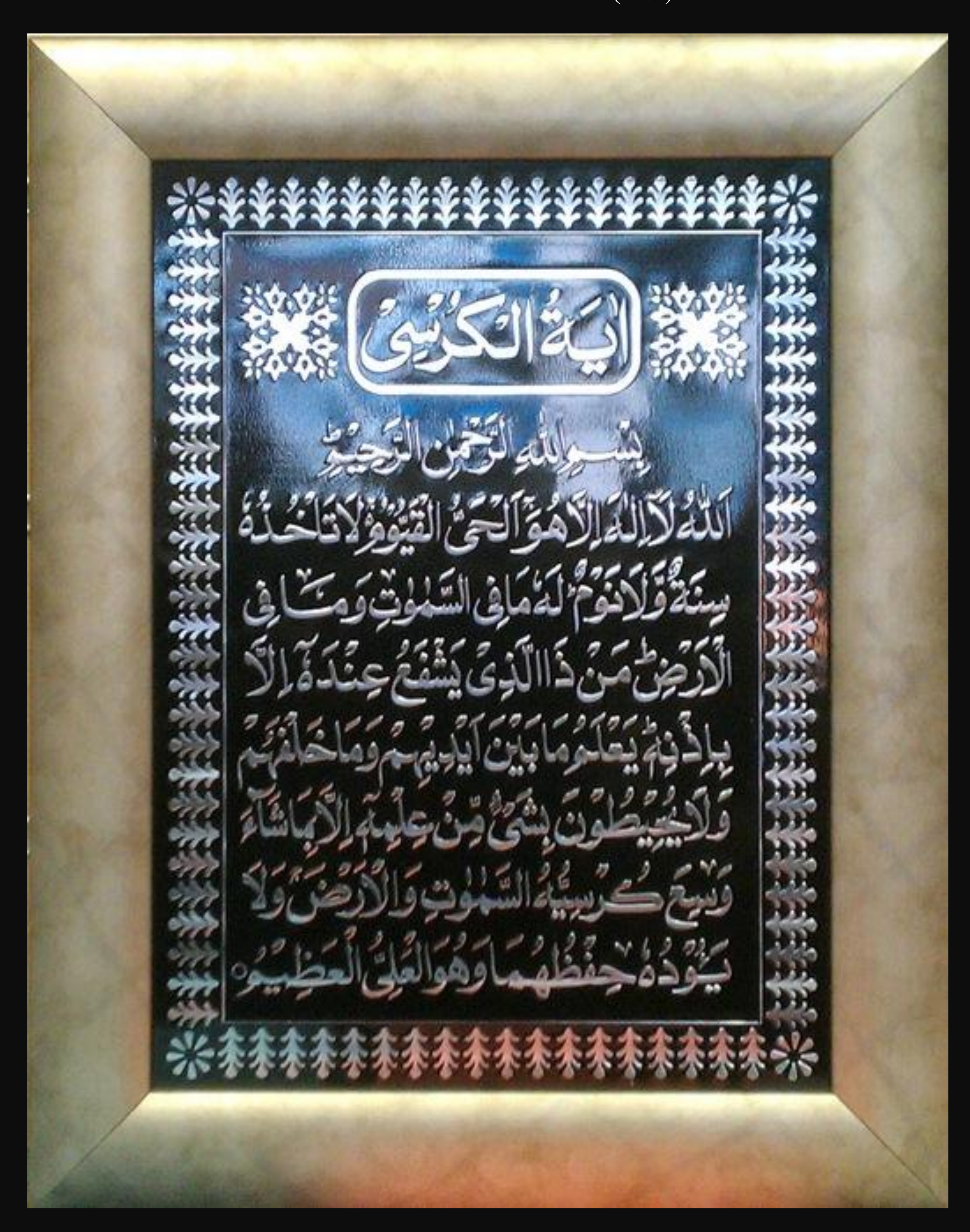
তাফসীরে আয়াতুল কুরসী

শায়খ আনওয়ার আল আওলাকি (রহ.)



শায়খ আনওয়ার আল আওলাকি (রহ.) তার একটি লেকচারে আয়াতুল কুরসীর তাফসীর করেন, এটা সেই লেকচারের বঙ্গানুবাদ।

BlackFlagSeriesInBangla কতৃক পরিবেশিত

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

আলহামদুলিল্লাহি ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আ'লা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদ ওয়া 'আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম।

উবাই বিন কা'ব (রাঃ) ছিলেন একজন আল- আনসার এবং একজন কাতিব আল- ওয়াহি (ওয়াহি লিখে রাখতেন)। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময়ে কুরআন লিপিবদ্ধকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষিত ব্যক্তি এবং সেই সাথে কুরআন সম্পর্কে একজন খুবই জ্ঞানী ব্যক্তি। তাকে সাহাবীদের মধ্যে কুরআনের একজন আলিম হিসেবে বিবেচনা করা হতো।

রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কুরআনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আয়াত কোনটি ?" উবাই বিন কা'ব (রাঃ) কে যিনি (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন তিনি (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) নিঃসন্দেহে ছিলেন সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী, তাই উবাই বিন কা'ব (রাঃ) রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে খুব সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে বললেন, "আল্লাহ এবং তার রসূলই ভালো জানেন।" এমনও হতে পারে যে তিনি চিন্তা করছিলেন - "আমি আবার কে যে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জবাব দিতে যাবো ? আমি কে ?" কিন্তু রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কাছ থেকেই জবাবটি শুনতে চাচ্ছিলেন। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আমাকে এর জবাব দাও।" সুতরাং রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলার জন্য জোর করলেন। উবাই বিন কা'ব (রাঃ) বললেন, "আয়াতুল কুরসি, 'আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওাল হাইয়্যুল কাইয়ুম' ।" এরপর রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "হে আবু মুনজির, তোমার জ্ঞানের কারনে তোমাকে অভিনন্দন।"

রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে পরীক্ষা করছিলেন। এটি ছিল একটি সাধারণ মৌখিক পরীক্ষা। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে একারনে প্রশ্ন করেন নি যে তার (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এই প্রশ্নের জবাবটি জানা দরকার ছিল বরং তিনি (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে প্রশ্ন করলেন এর মাধ্যমে তার জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য। আর এই পরীক্ষায় উবাই বিন কা'ব (রাঃ) পাস করলেন।

সুতরাং এই হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে আয়াতুল কুরসি হল কুরআনের সবচেয়ে সেরা আয়াত। কিন্তু এই আয়াতটি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আয়াত হওয়ার কারন কি ? কারনটা নির্ভর করে এটা কি সম্পর্কিত আয়াত আর কি ব্যাপারে এই আয়াত আলোচনা করে সেটার উপর। এই আয়াতে আল্লাহর তাওহীদের ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। একই কারনে কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা হল কুল হুওাল্লাহু আহাদ (সূরা ইখলাস)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা হল "কুল হু আল্লাহু আহাদ" আর সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত হল "আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হু, আল হাইয়্যুল কাইয়্যুম"।

সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের উচিত এই আয়াতটি মুখস্ত করা আর এর অর্থটি বুঝার জন্য চেষ্টা করা এবং এই আয়াত যে অর্থটি প্রকাশ করে সেটা আমাদের জীবনের সাথে মিশিয়ে এর প্রয়োগ করা। কারন বুঝে নেওয়া আর প্রয়োগ করার মধ্যে পার্থক্য আছে। এমন হতে পারে যে আপনি একটা ব্যাপার জানার পরও সেটার উপর আমল করছেন না, এই ক্ষেত্রে এর থেকে বরং না জানাই ভালো। ব্যাপারটা আপনারা সবাই বুঝতে পারেন। হাশরের মাঠে কুরআনে আপনার পক্ষে যেমন সাক্ষ্য দিতে পারে ঠিক তেমনি আপনার বিপক্ষেও সাক্ষ্য দিতে পারে। এমন হতে পারে যে কুরআন হাশরের মাঠে এসে

আপনার পক্ষে সাক্ষী দিবে যে আপনি কুরআনের অনুসরণ করেছিলেন। আর কুরআন আপনার বিপক্ষে সাক্ষী হতে পারে যদি কুরআন জানার পরও এর উপর আমল না করেন। কারন আমরা হাদিস থেকেই জানি যে দোজখে এমন ব্যক্তিকে নিক্ষেপ করা হবে যে কিনা একজন কুরআনের হাফিয ছিল ! চিন্তা করে দেখুন, সে পুরো কুরআন মুখস্ত করেছিলো। তাই সে যখন তাকে দোজখে নিক্ষেপের কারন জানতে চাইবে তখন তাকে জানিয়ে দেওয়া হবে যে সে এর উপর আমল করতো না এবং সে ইখলাসের সাথে আমল করেনি, তার আমলে কোন ইখলাস ছিল না, সেটা ছিল লোক দেখানো আমল।

সুতরাং ইসলাম আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে ইলম কোন উপকারে আসবে না যদি না তা প্রয়োগ করা হয়। আমি এই কথা বলছি এ কারনে যে উম্মাহর যুবকদের মধ্যে খুবই সুন্দর একটি পুনর্জাগরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তারা ইসলাম সম্পর্কে শিখতে চাচ্ছে যেমনটা পূর্বের জেনারেশনগুলোতে দেখা যায় নি। আপনি আপনার পূর্বের জেনারেশনের দিকে লক্ষ্য করুন এবং সেই জেনারেশনের আগের জেনারেশনটির দিকেও লক্ষ্য করুন, তারা ইসলাম শিখতে খুব একটা উৎসাহী ছিল না। আলহামদুলিল্লাহ্‌, উম্মাহর জন্য এটি খুবই ভালো লক্ষণ যে বর্তমানে এই উম্মাহর যুবকদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে চাচ্ছে। মুসলিম দেশগুলোতে একসময় এই দৃশ্য সাধারণ ছিল যে কেউ যদি ৯০% এর মার্ক পায় তবে সে মেডিসিন সম্পর্কে পড়াশোনার দিকে ঝুঁকে পড়তো, এর থেকে কিছুটা কম হলে ইঞ্জিনিয়ারিং এর দিকে, তার কিছু কম হলে অর্থনীতি আর আইন বিভাগের দিকে ঝুকে পড়তো এবং ৫০% এর বেশী মার্ক পেলে শারিয়াহ বিভাগে পড়াশোনার দিকে ঝুঁকে পড়তো। কিন্তু বর্তমানে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী শারিয়াহ অধ্যয়নের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। তাই এটি একটি ভালো লক্ষণ বলা যায়। কারন আপনারা জানেন যে মুসলিম বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শারিয়াহ বিভাগ থেকে প্রচুর পরিমানে গ্র্যাজুয়েট বের হয়ে আসে, কিন্তু তারা এখন কোথায় ? এই হাজার হাজার শিক্ষার্থীগুলো এখন কোথায় ? তাদের মধ্যে অনেকেই শারিয়াহ বিভাগে অধ্যয়ন করে এজন্য যে তাদের আর কোন বিকল্প বাকি ছিল না, শারিয়াহ বিভাগে অধ্যয়নের আসল কারন কিন্তু এটা ছিল না যে তারা আসলেই শারিয়াহ অধ্যয়ন করতে চায়। সুতরাং যুবকদের মধ্যে এটি একটি ভালো লক্ষণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বের যুবকদের ক্ষেত্রে। তারা সবসময়ই জানতে চায়, “আমরা কোথায় গিয়ে পড়াশোনা করতে পারি ? কোথা থেকে আমরা শিখতে পারি ?”

কিন্তু এই ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ না দিলেই নয় – “শুনুন, আপনি যদি আপনার অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী জীবনযাপন না করেন বা এর প্রয়োগ না করেন তবে জ্ঞান অর্জনের কোন মানেই হয় না।” মনে রাখবেন যে ইবলিস আপনার থেকে অনেক বেশী জ্ঞানী। আপনি আপনার সারাজীবন যতটুকু চান জ্ঞান অর্জন করুন কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ইবলিস শারিয়াহ’র ব্যাপারে আপনার থেকেও বেশী জ্ঞান রাখে। আপনি যদি সারাজীবন ধরেও ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করেন তবুও আপনি তার থেকে কম জ্ঞানীই থেকে যাবেন কারন তার জ্ঞানের স্তর ফেরেশতাদের জ্ঞানের স্তরের সমান। কিন্তু সে সবই হারালো। এর কারন কি ছিল ? কারন ছিল তার কিবর (অহংকার)।

বানি ইসরাইলের আহবার (আলিম) দের জ্ঞান তাদের কি কাজে এসেছিলো ? অথবা ঈসা (আঃ) এর সময়কার তাওরাতের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে কি তাদের জ্ঞান কোন কাজে এসেছিলো ? ঈসা (আঃ) যখন লোকদের দাওয়াহ করছিলেন, সে সময় যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম তাকে প্রত্যাখ্যান করলো সে ছিল বানি ইসরাইলের একজন তাওরাত শিক্ষক। তাই ইলম কোন কিছুর নিশ্চয়তা দেয় না। এটি জান্নাতের চাবির কোন নিশ্চয়তা দেয় না। এটি হল ইলমের প্রাসঙ্গিকতা।

একবার ইমাম আহমাদ ইবন হানবালের ছাত্ররা তার কাছে এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলল, “এই ব্যক্তির কোন ইলমই নেই। সে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি নয়।” ইমাম আহমাদ বললেন, “তার তো ইতিমধ্যেই ইলমের ফল রয়েছে, তিনি

আল্লাহ্‌কে ভয় করেন।” ইমাম আহমাদের দ্বীনের ফিকহ (দ্বীনের বুঝ) এর দিকে লক্ষ্য করুন - তিনি বললেন, “এই ব্যক্তির মধ্যে প্রচুর ইলম না থাকার কারনে তোমরা উনাকে তাচ্ছিল্য করো না কারন তার মধ্যে তো ইতিমধ্যেই ইলমের ফল রয়েছে।” আল্লাহ কুরআনে বলেছেনঃ

“যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে তারাই আলিম” {সূরা ফাতির, ৩৫ : ২৮}

তাই ইমাম আহমাদ বলছেন যে যেহেতু এই ব্যক্তির মধ্যে প্রচুর ইলম না থাকার পরও তাকওয়া আছে যেটা অর্জনের জন্য আলিমরা কঠোরভাবে চেস্টা করে যান তাই তোমরা তাকে তাচ্ছিল্য করো না।

আয়াতুল কুরসি হল তাওহীদের একটি আয়াত।

ইতিহাসের পিছে মার্ক্সবাদীদের রয়েছে নিজস্ব ব্যাখ্যা, পুঁজিবাদীদেরও নিজস্ব ব্যাখ্যা রয়েছে, কিন্তু ইতিহাসের ব্যাপারে ইসলামেরও নিজস্ব ব্যাখ্যা রয়েছে। আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে হক আর বাতিলের দ্বন্দ্বে ইতিহাস তৈরি হয়। আম্বিয়ারা এক পাশে আর শয়তানের অনুসারীরা অপর পাশে, এবং এই দ্বন্দ্ব চলতে থাকে এক জেনারেশন থেকে আরেক জেনারেশনে, এটিই আমাদের জীবনের বাস্তবতা, যা শুরু হয়েছিলো আদম (আঃ) এর সময় থেকে আর চলতে থাকবে কিয়ামতের আগ পর্যন্ত। এই দ্বন্দ্ব হল আল্লাহর আউলিয়া (বন্ধু) ও শয়তানের আউলিয়ার মধ্যকার এক দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব হল আল্লাহর অনুসারী ও শয়তানের অনুসারীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব। এটাই, এটাই হল ইতিহাস। আর এখানের মুল ব্যাপারটি হল তাওহীদ। আল্লাহ বলেনঃ

“আমি তোমার আগে এমন কোন রসূল পাঠাইনি যার কাছে ওয়াহি পাঠিয়ে আমি একথা বলিনি যে আমি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এবং তোমরা সবাই আমারই ইবাদাহ করো।” {সূরা আল আম্বিয়া, ২১ : ২৫}

আল্লাহ ছাড়া আর কিছুর ইবাদাহ করা যাবে না। এটি হল মানবজাতির ইতিহাস। এই দ্বন্দ্ব হল সেই দুটো দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব যারা আল্লাহর ইবাদাহ ও গোলামী করতে চায় আর যারা চায় যে তাদের বা তাদের বাতিল দেবতার বা টাকা পয়সার বা কতৃত্বের ও ক্ষমতার ইবাদাহ ও গোলামী করা হোক। আর একারনেই এসব কিছুর মুল ব্যাপার তাওহীদের আলোচনার কারনে এই আয়াতটি কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত আর একই কারনে সূরা ইখলাসও সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা।

আয়াতুল কুরসিতে পৃথক পৃথক অর্থ বিশিষ্ট দশটি বাক্য রয়েছে।



অর্থঃ মহান আল্লাহ তায়ালা, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই

মহান আল্লাহ তাকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাহ করার ব্যাপারটি বাতিল করে দিয়েছেন, একমাত্র তারই ইবাদাহ করতে হবে। “আল্লাহ এক” এটা বলার তুলনায় এখানে যে উপায়ে আল্লাহর একত্ববাদ অর্থাৎ তাওহীদ উপস্থাপন করা হয়েছে

সেটিই তুলনামুলকভাবে দৃঢ় উপায়। “আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই” এই বাকটি হল “আল্লাহ এক” এই বাক্যের থেকে তুলনামুলক বেশী দৃঢ়। “আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাহ করা যাবে না” বাক্যটি হল “আল্লাহর ইবাদাহ করতে হবে” এই বাক্যটি থেকেও বেশী দৃঢ়, কারন এটা যে অর্থ প্রকাশ করবে তা হল আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কারো ইবাদাহও করা যাবে। কিন্তু আল্লাহ বলছেন, “আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।” এভাবেই সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ তায়ালা কতৃত্ব ও ক্ষমতা প্রত্যেকের কাছ থেকে পরিস্কারভাবে দূরে সরিয়ে দিয়ে একমাত্র তার জন্যই নির্দিষ্ট করে দিলেন।

الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ

অর্থঃ তিনি চিরঞ্জীব ও অমুখাপেক্ষী।

আল হাই এবং আল কাইয়ুম হল আল্লাহর দুটো নাম। আমরা বিশ্বাস রাখি আল্লাহর নামগুলোতে, সেগুলোর অর্থগুলোতে এবং আমাদের উচিত সেই নামের অর্থগুলোর শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন করা।

“আল হাই” অর্থ হল জীবিত। মহান আল্লাহ হলেন চিরঞ্জীব, তিনি সবার আগে থেকে আছে আর তিনিই সবার শেষে থাকবেন – তিনি আল আওওয়াল ওয়াল আখির।

আল কাইয়ুম অর্থ হল সকল কিছুর অস্তিত্ব তারই মুখাপেক্ষী কিন্তু তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। আপনি হয়তো বলতে পারেন যে আল্লাহ জীবিত আছেন আর আমরাও তো জীবিত আছি। কিন্তু পার্থক্য হল আল্লাহর জীবন হল সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাকে কারো উপর নির্ভর করতে হয় না। কিন্তু আমাদের জীবন তার উপর নির্ভর করে। আল্লাহ আমাদের অস্তিত্ব না দিলে আমরা টিকে থাকবো না। তার মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া কোন কিছুই টিকে থাকতে পারবে না, তার সাহায্য ছাড়া কিছুই দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ

অর্থঃ তন্দ্র বা নিদ্রা তাকে ধরতে পারে না

ইবন কাসির তার তাফসীরে এই ঘটনাটি উল্লেখ করেন। একবার মুসা (আঃ) কে বানি ইসরাইলের এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, “আল্লাহ কি ঘুমান ?” মুসা (আঃ) কে দুইজন ফেরেশতা এই প্রশ্নের জবাব দেন। তার মুসা (আঃ) এর কাছে এসে বললেন, “হে মুসা, আমরা আপনাকে এই রাতে দাঁড়ানো ও জেগে অবস্থায় দেখতে চাই।” তারা তাকে দুটি বোতল দিয়ে এই বোতল দুটো ধরে রাতে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য বললেন। সুতরাং তিনি সেই রাতে বোতল দুটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। মুসা (আঃ) খুব ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন। মুসা (আঃ) সারাদিন ধরে দাওয়াহ’র কাজ করতেন আর দাওয়াহ’র কাজ খুবই পরিশ্রমের কাজ। যাই হোক, তিনি এই বোতল দুটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন আর রাতের প্রথম অংশ অতিক্রান্ত হয়ে গেলো। তিনি কোনমতে নিজেকে ধরে রাখলেন। রাতের দ্বিতীয় অংশও পার হয়ে গেলো, তার ছোট্ট ও হালকা নিদ্রা এসে গেলো তবে তিনি আবার জেগে উঠলেন। তখনও কিন্তু তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। কিন্তু রাতের

তৃতীয়াংশে তিনি নিজের নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ফেললেন। তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না। সুতরাং তিনি ঘুমের চোটে পড়ে গেলেন আর বোতল দুটিও পড়ে গিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। ফেরেশতা দুজন মুসা (আঃ) এর কাছে এসে বললেন, "হে মুসা, আল্লাহ যদি ঘুমতেন তবে আসমান ও দুনিয়ার পতন হতো আর এই বোতল দুটোর মত ভেঙে চুরমার হয়ে যেত।"

আল্লাহ যদি নিদ্রা যেতেন তবে আসমান জমিনের সব কিছুর পরিচালনা আর ব্যবস্থাপনা কে করতো ? আল্লাহ আজ্জা ওয়া যাল কখনও নিদ্রা যান না। তিনি কখনও বিশ্রামও গ্রহন করেন না। খ্রিস্টান ও ইয়াহুদিরা দাবী করে যে আল্লাহ আজ্জা ওয়া যাল ছয় দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন আর সপ্তম দিনে তিনি বিশ্রাম গ্রহন করেছিলেন। এই ধারনাটি সাব্বাথ নামে পরিচিত যা দিয়ে বুঝানো হয় যে সৃষ্টিকর্তার বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। যদিও ছয় দিনে সৃষ্টির ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস আছে, কিন্তু আল্লাহর বিশ্রামের প্রয়োজন এটা আমাদের আকিদাহ নয়। বাইবেলের প্রথম পৃষ্ঠা বুক অফ জেনেসিসে সৃষ্টির কাহিনী সম্পর্কে বলা আছে যে আল্লাহ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনে কি করেছেন এবং সেখানে এরপর বলা আছে যে এরপর স্রষ্টা সপ্তম দিনে বিশ্রাম গ্রহন করেন। আল্লাহ এই ব্যাপারে সূরা কাফ –এ জানিয়ে দেন,

"আমি আকাশমালা, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে তার সব কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি" {সূরা কাফ, ৫০ : ৩৮}

আল্লাহ জানিয়ে দিলেন যে তিনি ছয় দিনেই আসমানসমূহ আর দুনিয়া সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু তিনি এরপরই বলেন,

"কোন ধরণের ক্লান্তিই আমাকে স্পর্শ করেনি।" {সূরা কাফ, ৫০ : ৩৮}

কোন ক্লান্তি বা অবসাদ আল্লাহ্‌কে স্পর্শ করেনি। সুতরাং কুরআন এসেছে বাইবেলকে সংশোধন করার জন্য। তাই কুরআন বাইবেলের যেটা সঠিক সেটাকে অনুমোদন দেয় আর যেটা ভুল সেটাকে অনুমোদন দেয় না।

لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ

অর্থঃ আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে তার সব কিছুরই একচ্ছত্র মালিকানা তার

আমরা তো এটা সবাই- ই জানি, তাই না ? এটি তো সাধারণ জ্ঞান। আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে তার সবই আল্লাহর অধিকারভুক্ত। কিন্তু এই ব্যাপারে কি আমাদের ইয়াকিন আছে ?

ইলম আর ইয়াকিনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। একটি হল ইলম আরেকটি হল ইলম আল ইয়াকিন। আপনি যদি কোন রকমের সন্দেহ ছাড়াই একেবারে সুনিশ্চিত হোন যে সব কিছুর মালিকানা আল্লাহর, তবে আপনার জীবনযাত্রা একদম অন্যরকম হয়ে যাবে কারন এর অনেক প্রভাব রয়েছে। যেহেতু আসমানসমুহে ও জমিনের সব কিছুর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর নিকট, তাই কোন কিছুই তার অনুমতি ছাড়া ঘটবে না। যেহেতু আসমানসমূহ ও জমিনের প্রত্যেকটা জিনিষের মালিক আল্লাহ, তাই আপনি তার অনুমতি ছাড়া একটা পয়সাও পাবেন না। এই ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝতে পারলে আপনার জীবন পুরোই পরিবর্তন হয়ে যাবে। যেহেতু প্রত্যেকটি জিনিষই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণের অধীনে, প্রত্যেকটি জিনিষই

আল্লাহর মালিকানাধীন, তবে আপনার কাকে ভয় করা উচিত ? অবশ্যই একমাত্র আল্লাহ্‌কে। কোন কিছুর ব্যাপারেই আপনাকে উদ্বিগ্ন হতে হবে না কারন সবই তো তার কাছ থেকেই আসে।

ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে বলা আছে, "এবং এই ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝে নাও যে, যদি সমগ্র মানবজাতি মিলেও যদি তোমার কোন উপকার করতে চায় এরপরও তোমার ভাগ্যে আল্লাহ যা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তার বাইরে তোমার কোন উপকার করতে কখনও সক্ষম হবে না । আর সমগ্র মানবজাতি মিলেও যদি তোমার কোন ক্ষতি করতে চায়, তবুও আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্ধারিত করে রেখেছেন তার বাইরে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না । কারণ ভাগ্যের কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং কাগজ শুকিয়ে গেছে ।"

আমাদের তাকদিরের সবই পূর্বে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং কলম তুলে নেওয়া হয়েছে আর কালিও শুকিয়ে গেছে, এটি হল অপরিবর্তনীয় কালী, আপনি এটা মুছে ফেলতে পারবেন না। আমরা কেউই এর সংশোধন করতে পারবো না, আল কদরের ব্যাপারে এটা কাজ করবে না।

তাবারানিতে বর্ণিত আরেকটি হাদিস হল, রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যদি আল্লাহ আজ্জা ওয়া যাল তার সমগ্র সৃষ্টিকে শাস্তি দিতে চান তবে সেটা অন্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে না। আর যদি তিনি তার কোন সৃষ্টির প্রতি করুনা দেখাতে চান তবে তো তার সেই করুনা তার সৃষ্টির কোন কর্মের থেকেও উত্তম। আর এই ব্যাপারটি বুঝে নাও যে, তোমরা যদি উহুদ পাহাড়ের সমতুল্য স্বর্ণ আল্লাহর পথে ব্যয় করো তবে এটি ততক্ষন পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত তাকদিরে বিশ্বাস করছো আর এর প্রতিও বিশ্বাস রাখছো যে তোমার যা ঘটেছে তা প্রতিহত করা যেতো না আর তোমার যা ঘটে নি তা না ঘটারই ছিল এবং তুমি যদি এটা বিশ্বাস রেখে মারা যেতে না পারো তবে তোমার স্থান হবে দোজখে।"

চলুন আমরা এই হাদিসটির দিকে লক্ষ্য করি। আল্লাহ যদি তার সমগ্র সৃষ্টিকে শাস্তি দিতে চান তবে সেটাকে অন্যায় হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। বলতে পারেন এটার মাধ্যমে কি বুঝানো হয়েছে ? আল্লাহ যদি তার সম্মানিত ফেরেশতাগণ, তার নবী- রসূলদের, সাহাবীদের, তাবে'ইদের ও তার সালিহ বান্দাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করেন আর সেখানেই অনন্তকালের জন্য তাদের বন্দী করে রাখা হয় তবে এটাকে কখনোই অন্যায় হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। আল্লাহ যদি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) সহ অন্যান্য সকল নবী রসূলদেরকে আর জিবরাঈল (আঃ) কে অনন্তকালের জন্য দোযখে শাস্তি দিতে চান তবে মনে রাখতে হবে যে আল্লাহর অধিকার রয়েছে তা করার। কেন ? কারন আমরা তো সকলেই আল্লাহর মালিকানার অন্তর্ভুক্ত। তাই তার অধিকার আছে আমাদের ব্যাপারে যা খুশি করার। আর আমাদের কোন অধিকার নেই তাকে কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করার কিন্তু তিনিই আমাদেরকে সবকিছুর ব্যাপারে প্রশ্ন করার অধিকার রাখেন। আমরা প্রত্যেক কিছুর জন্য তার কাছে ঋণী কিন্তু তিনি কারো কাছেই কোন কিছুর জন্যই ঋণী নন (কারন তিনি অমুখাপেক্ষী)।

অতএব যখনই আল্লাহ তার সৃষ্টির কিছুর প্রতি করুনা প্রদর্শন করেন তখন মনে রাখতে হবে যে সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা রহমত, যার বা যাদের প্রতি তিনি সেই রহমত প্রদর্শন করেন সেটা তারা অর্জন করেনি বরং তিনি নিজ থেকেই সেটা তাকে বা তাদের দান করেন। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "কেউই তার আমলের কারনে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" তখন এক সাহাবী জানতে চাইলেন, "ইয়া রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম), এমনকি আপনিও ?" রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আল্লাহ যদি আমার উপর রহমত না করেন তবে এমনকি আমিও আমার আমলের কারনে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো না।"

এর কারন হল এই যে, আমরা সকলেই আদম সন্তান আর মানুষদের সৃষ্টি করাই হয়েছে এমন একটি নির্দিষ্ট উপায়ে যে তারা পাপ কাজ করবেই। সুতরাং এটি হল আল্লাহর একটি রহমত। আল্লাহ তার কার্যসাধনের উপায়গুলো আমাদের উপর বাস্তবায়ন করতে চান। তিনি চান আমাদের উপর তার আল গাফুর, আর- রহীম ও আর- রহমান নামের অর্থ প্রয়োগ করতে।

আমি আপনাদের সামনে একটা হাদিস উল্লেখ করতে চাচ্ছি যেটা উল্লেখ করতে আমি ভালবাসি, যদিও হাদিসটি সরাসরি সম্পর্কিত নয়। বিশেষ করে এই পশ্চিমা সমাজে যেখানে কিনা আমরা প্রত্যেক দিক থেকে হাজারো পাপ দিয়ে ঘেরাও আছি যেগুলোর প্রভাবে এই সমাজে দ্বীনের উপর অটল থাকা মাঝে মাঝে সত্যিই কঠিন হয়ে পড়ে। যাই হোক, যে হাদিসটি বলতে চাচ্ছিলাম সেটা বুখারীতে রয়েছে।

বানি ইসরাইলের এক লোক নিরানব্বই জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছিলো। চিন্তা করে দেখুন, নিরানব্বই জন ! একজন সিরিয়াল কিলার ! আপনারা বিশ্বাস করুন আর না- ই করুন, এই লোকটি এমন একজন অপরাধী হওয়ার পরও তার অন্তরে ভালো কিছু ছিল। সে নিরানব্বইজন নিরীহ লোক হত্তার পর তাওবা করতে চাচ্ছিল। এই মানুষটি ছিল অজ্ঞ, তাই সে জানতে চাইলো, "কোথায় আমি কোন জ্ঞানী ব্যক্তির খোঁজ পেতে পারি ? আমাকে তোমরা দেখিয়ে দাও।" লোকজন তাকে একজন আবিদের ব্যাপারে জানিয়ে দিলো যে কিনা তার জীবন আল্লাহর ইবাদাতে নিযুক্ত করে দিয়েছে। এরপর খুনি লোকটি এই আবিদ ব্যক্তির কাছে গিয়ে বলল, "আমার অবস্থা এখন এমন যে আমি নিরানব্বই জন লোক হত্যা করেছি, আল্লাহ কি আমাকে ক্ষমা করবেন ?" এই আবিদ বলল, "কোন উপায় নেই, তুমি তো নিরানব্বই জন লোককে হত্যা করে ফেললে!"

একজন আবিদ, যে কিনা তার জীবনটা আল্লাহর ইবাদাতে কাটিয়ে দিয়েছে, যে কিনা রাস্তাঘাটে কোন গুনাহ করে নি, যে তার জীবনের কোন সময় রাস্তাঘাটে পার করে নি, যে ছিল না একজন স্ট্রিট বয়, যে কখনও কোন মাদকের মুখোমুখি হয় নি, সে কখনোই এসব গুনাহে লিপ্ত হয় নি। আর নিরানব্বই জনকে হত্যার ব্যাপার তো সে চিন্তাই করতে পারে না। তাই সে হয়তো চিন্তা করলো একজন লোক কিভাবে পারে এই কাজ করতে ? আর সে এই পরিস্থিতি কল্পনাও করতে পারে না। তাই সে সোজাসাপ্টা বলে দিলো, "কোন উপায় দেখছি না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন।"

এরপর তাওবার নিয়্যতে আসা সেই লোকটি কি করলো ? সে এই আবিদকেও হত্যা করলো। কোন কারন ছাড়াই সে আবারও হত্যা করলো। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে সে ছিল একজন পাষাণহৃদয়ের নির্মম খুনি, সে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতো। সুতরাং তার খুনের শতক পূর্ণ হল। কিন্তু এরপরও তার অন্তর তাকে তাওবা করার ব্যাপারে আওয়াজ দিয়ে যাচ্ছিল। তার অন্তরের গভীর থেকে কেউ যেন তাকে আবারও চেষ্টা করার জন্য বলছিল। তাই সে আবারও লোকদের জিজ্ঞেস করলো আর তারা তাকে একজন আলিমের কাছে যেতে বলল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে একজন আলিম আর আবিদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

অতএব সে এবার একজন আলিমের কাছে গিয়ে বলল, "আমি একশ লোক খুন করেছি, আল্লাহ কি আমাকে ক্ষমা করবেন ?" আলিম তাকে বলল, "এমন কি আছে যা তুমি আর তোমার তাওবার মাঝে অন্তরায় হতে পারে ?" ব্যাপারটি আসলে এমনই। কেউ যদি তাওবা করে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে চায় তবে এমন কে আছে যে তাকে সেটা করতে বাধা দিবে ? কে আছে যে তার আর আল্লাহর মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে ? কারই বা আছে তাকে তাওবা থেকে বাধা দেওয়ার অধিকার ? আল্লাহই আপনাকে সৃষ্টি করেছেন আর মনে রাখতে হবে যে আল্লাহর ও আপনার মাঝে কোন মাধ্যম নেই (অর্থাৎ, আপনি সরাসরি আল্লাহর কাছে চাইতে পারবেন)। কেউই আপনাকে আল্লাহর কাছে তাওবা করা থেকে বাধা

দিতে পারবে না। আল্লাহর কাছে তখন সেটা কোন ব্যাপার হবে না যে আপনি কত বড় পাপ করেছিলেন, আপনার যেকোন পাপের পরও আপনার সামনে তাওবার দরজা খোলা রয়েছে। যাই হোক, আলিম তাকে জানিয়ে দিলেন যে তার সামনে তাওবার দরজা খোলা আছে।

এখন আপনি এই আলিমের ইলমের প্রতি লক্ষ্য করুন। তিনি পরিস্থিতির ভিত্তিতে তাকে ফাতওয়াটি দিলেন। এই ফাতওয়াটি সময় ও স্থানের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছিলো। আলিম তাকে বলে দিলেন, "কিন্তু তোমাকে এই পাপের শহর ছেড়ে অন্য শহরে চলে যেতে হবে যেখানকার লোকেরা সৎ কাজ করে আর তারা তোমাকে আল্লাহর ইবাদাতে সাহায্য করবে।" তার ফাতওয়াটি খেয়াল করুন। তিনি বললেন যে সেই শহর, সেই পরিবেশ আর সেসব কিছু যা তার পাপ কাজে সাহায্য করে সেগুলো সবই ছেড়ে চলে যেতে। যদিও সেই ব্যক্তি তার পাপ থেকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করছে এবং সেই সাথে তার সেই শহর থেকেও যেখানে সে একশ লোক খুন করেছে, এই ভয়ংকর মুহূর্ত ও স্মৃতিগুলোর প্রত্যেকটি ঠিকই তার কাছে ফিরে আসবে। তখন সে জুলুমের চক্র থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম হবে না। সুতরাং তার উচিত তার চারপাশের পরিবেশ পরিবর্তন করা। তার পাপের সাথে যুক্ত লোকদের চেহারা, বিল্ডিং, বৈশিষ্ট্য যা কিছুই আছে না কেন সবই পরিবর্তন করা। তাই আলিম লোকটিকে সেই শহর থেকে অন্য শহরে হিজরত করতে বললেন। এখানে লোকটি যে হিজরত করলেন সেটা হল পাপযুক্ত স্থান থেকে ইবাদাতের স্থানের দিকে হিজরত করা।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার লক্ষ্য করুন যে আলিম সেই পাপের শহরে থাকার পরও তিনি নিজেই কিন্তু হিজরত করলেন না। সুতরাং ব্যক্তি ভেদে হিজরত মাঝে মাঝে ভিন্ন হয়ে থাকে। বিশেষ সময়ে হিজরত করা ফরজ। যখন রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন হিজরত করাটা ফরজ হয়ে যায় কারন হল সেটা ছিল রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আদেশ। ঠিক একই কারনে যদি কোন ইসলামিক রাষ্ট্র (খিলাফাহ) থাকে আর খলীফা সেখানে হিজরতের জন্য আহবান করেন তবে সেখানে হিজরত করা ফরজ হবে। কিন্তু অন্য পরিস্থিতির কথা বিবেচনা অনুযায়ী, পাপের স্থানে আল্লাহর ইবাদাহ করা সম্ভব না হলে আপনাকে এমন এক স্থানে হিজরত করতে হবে যেখানে আপনি আল্লাহর ইবাদাহ করতে পারবেন, আর এটা ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তির জন্য সেই স্থান আর কোন ব্যক্তির জন্য অন্য কোন স্থান। সুতরাং এটি হল ব্যক্তি ভেদে পৃথক ইস্যু, এর জন্য কোন সাধারণ ফাতওয়া নেই। তাই সেই আলিম হিজরত করলেন না কিন্তু সেই হত্যাকারী ব্যক্তিটি আলিমের উপদেশ অনুযায়ী হিজরত করলেন।

আমি আমার যুবক ভাইদের আর এখানে যদি কোন বোন থেকে থাকেন তবে তাদের বলতে চাই যে, এই হাদিস আপনাদের বলে দিচ্ছে যে সঙ্গীসাথী বা বন্ধুর ব্যাপারটা আমাদের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে তরুন ও যৌবনে। আপনার বন্ধু আর সঙ্গী যেমন, আপনিও তেমনই হয়ে থাকবেন। সুতরাং আপনার চারপাশে থাকা লোকদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। আপনি যাদের সাথে মিলেমিশে থাকেন তাদের ব্যাপারে সতর্ক হোন। আপনারা এটা মনে করতে যাবেন না যে আপনারা এতই শক্তিশালী মনের লোক যে আপনারা পুরো দুনিয়ার দায়িত্ব একাই গ্রহণ করতে পারবেন আর এতেও কিছু যায় আসে না যে আপনাদের চারপাশে কে বা কারা আছে অথবা এটা যে আপনারা আপনাদের ঈমানের উপর দৃঢ়ভাবে অটল থাকবেন। না, এটা মনে করতে যাবেন না। বরং আপনাকে সুনিশ্চিত হতে হবে যে আপনার কিছু ভালো বন্ধু আছে কারন রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে দলছুট বকরীকেই বাঘ ধরে খায়। সুতরাং আপনি নিশ্চিত হোন যে ন্যায়নিষ্ঠ জামাআহ থেকে আপনি বিচ্ছিন্ন নন। ভাইদের উচিত ভালো দ্বীনী ভাইদের কাছাকাছি থাকা আর বোনদের উচিত ভালো দ্বীনী বোনদের কাছাকাছি থাকা।

আমরা সেই ঘটনায় ফিরে যাই। তো সেই সিরিয়াল কিলার ব্যক্তিটি তাওবার নিয়্যতে সে স্থান থেকে হিজরত করে আলিম যে শহরের ব্যাপারে বলেছিলেন সেটার দিকে যেতে থাকলেন কিন্তু সেই শহরে পৌঁছানোর পূর্বেই সে মারা যায়। কেউ যখন মারা যায় তখন তার আত্মা হয় আযাবের ফেরেশতারা বা রহমতের ফেরেশতারা গ্রহণ করতে আসেন। সুতরাং তার আত্মাকে গ্রহনের জন্য আযাবের ফেরেশতারা আসলো, কিন্তু রহমতের ফেরেশতারা তার সাথে বিতর্ক শুরু করলো। রহমতের ফেরেশতারা বললেন, "সে আল্লাহ কাছে তাওবা করে ফিরে এসেছে, তাই আমরা তাকে আল্লাহর রহমতের দিকে নিয়ে যাবো।" অন্যদিকে আযাবের ফেরেশতারা বললেন, "আরে সে তো কোন ভালো কাজই করে নাই বরং একশ ব্যক্তি খুন করেছে।" সুতরাং তাদের মধ্যকার এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাদের মধ্যকার বিতর্কের অবসান করে দেওয়ার জন্য একজন ফেরেশতা পাঠালেন। সেই ফেরেশতা তাদেরকে দুই শহর আর তার মৃত্যুস্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাপ করতে বললেন। যদি মেপে দেখা যায় যে সে তার পাপের শহরের নিকটবর্তী তবে তার বাসস্থান হবে দোযখ, আর যদি দেখা যায় যে তার অবস্থান সে যে শহরের উদ্দেশ্যে হিজরত করার জন্য বের হয়ে গিয়েছিলো সে শহরের নিকটে তবে তার বাসস্থান হবে জান্নাত। এখানে উল্লেখ্য একটি ব্যাপার হল এই যে, এই ব্যক্তির অবস্থান ছিল তার পাপের শহরের নিকটে। কিন্তু আল্লাহর কি রহমত তা বুঝে নিন। হাদিসেই বলা আছে যে আল্লাহর নির্দেশে সামনের ভুমি এই ব্যক্তির নিকটবর্তী হয়ে যায় আর পিছনের ভুমি তার থেকে দূরে সরে যায়। সুতরাং ফেরেশতারা রাস্তা মাপতে গিয়ে দেখলেন যে এই ব্যক্তি তার হিজরতের শহরের নিকটে মারা গিয়েছে, ফলে তার স্থান হল জান্নাতে।

এই সিরিয়াল কিলার লোকটি যদিও পাপের শহরের নিকটেই মারা গিয়েছিলো কিন্তু আল্লাহ তাকে দোজখের আগুন থেকে রক্ষার জন্য ভুমির পরিবর্তন করে দিলেন আর এর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের দেখিয়ে দিলেন যে তিনি তার মত করেই তার গোলামদের উপর করুনা প্রদর্শন করে যাবেন যদি তারা সত্যিই আল্লাহর করুণা পেতে চায়। আর আল্লাহ এমন এক ব্যক্তিকে এই করুণা দেখালেন যে কিনা একশ জন লোক হত্যার দায়ে অপরাধী। এমন কি আর কোন পাপ আছে যা ক্ষমার যোগ্য ? আপনি যত বড় গুনাহই করে না কেন যদি আপনি তাওবা করেন তবে আল্লাহ ক্ষমা করবেন। সুতরাং আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে।

আবার একজন ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হওয়ার পরও আল্লাহর কাছে ক্ষমা না চাওয়ার কারনে দোজখে যেতে পারে।

জাহিলিয়্যাহ যুগে আবদুল্লাহ বিন জাদান নামের এক ব্যক্তি ছিল। সে ছিল কুরাইশদের মধ্যে একজন মহৎ ব্যক্তি। সে ছিল খুবই সৎকর্মপরায়ণশীল ও উদার। সে প্রচুর ভালো কাজ করতো, গরীব ও দুর্বলদের সাহায্য করার জন্য সে দাঁড়িয়ে যেতো। আইশা (রাঃ) রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম), আপনি কি আবদুল্লাহ বিন জাদানের সেই সব ভালো কাজগুলো দেখেছেন ? সেই কাজগুলো কি বিচার দিবসে তার কোন উপকার করবে ?" রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "না, কারন সে এমনকি একবারের জন্যও বলেনি – 'হে আল্লাহ, আপনি আমার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিন' "। এই ব্যক্তি শিরকের উপর মারা গিয়েছিলো। সে তার গুনাহগুলো ক্ষমা করার জন্য আল্লাহর কাছে দুয়া করতো না, ফলে সে সবই হারালো।

সুতরাং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাথে শক্তভাবে লেগে থাকুন আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকুন। অবশ্যই সতর্ক থাকবেন এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার চেষ্টা করবেন না। অনেক লোকই বলে, "ও আচ্ছা, আল্লাহ যেহেতু খুবই দয়ালু আর ক্ষমাশীল, তাহলে তো এর সুবিধা নেওয়া যায়। সুতরাং আমি সব ধরণের পাপ করে পরিতৃপ্ত হওয়ার পর আল্লাহ্‌কে বলবো – 'হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন' "। এটা তাওবার সঠিক উপায় না। কারন রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "তাওবা হল অনুতপ্ত হওয়া।" সুতরাং আপনাকে অবশ্যই আপনার পাপের কারনে অনুতপ্ত হতে হবে। এটা ভুলেও মনে করতে যাবেন না যে আপনি পাপের মাধ্যমে আল্লাহর রহমতের সুবিধা নিবেন আর

এরপর আল্লাহ আপনাকে যে করেই হোক ক্ষমা করে দিবেন। বরং আপনি আপনার পাপের পর সেটার ব্যাপারে অনুতপ্ত হবেন, আপনি সেটা আর না করার জন্য প্রতিজ্ঞা করবেন। এটি হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি মুল ব্যাপার। এবং আল্লাহর সামনে আপনি নিজেকে বিনয়ী করে আত্মসমর্পণ করবেন আর সিজদাহ করবেন এবং আল্লাহর কাছে দুয়া করবেন যেন তিনি আপনাকে ক্ষমা করে দেন, এই 'নাদম' হল সেটাই যা কিনা শরীর থেকে পাপগুলো পরিস্কার করে দেয়।

আমাদের আলোচ্য আয়াতাংশ ছিল - لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ

আসমান ও জমিনের সবকিছুর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। তাই আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেই ভয় করা উচিত না।

এই উম্মাহর অন্যতম মহান আলিম আল ইয ইবন আবদুস সালাম একবার একজন অত্যাচারী যালিম শাসককে উপদেশ দিতে গেলেন। তিনি অত্যাচারী শাসকটির সামনে উপস্থিত হওয়ার পর তাকে নাসিহাহ করা শুরু করলেন, তার গলার স্বর প্রথমে নরম থাকে কিন্তু ধীরে ধীরে তার গলার আওয়াজ বৃদ্ধি পেতে থাকে এমনকি এক পর্যায়ে তিনি সেই অত্যাচারীর দিকে ইশারা করে আর তার চেহারার দিকে তাকিয়ে তীব্র আওয়াজে নাসিহাহ করেন। তিনি নাসিহাহ করে ফিরলে তার ছাত্ররা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা আপনি কি করলেন ?" এই মহান আলিম বললেন, "যখন আমি এই অত্যাচারীর দিকে তাকালাম, তখন আমি আল্লাহর মহিমার ব্যাপারে চিন্তা করলাম সুতরাং এই জালিম আমার কাছে একটি বিড়ালের থেকেও ক্ষুদ্র মনে হল। আমি চিন্তা করলাম আল্লাহ কতই না মহান। আমি আমার চিন্তাভাবনা সঠিক বিষয়টির উপর স্থাপন করার পর যে জালিমের নাম শুনলেই তোমাদের হাঁটু কাঁপা শুরু হয় তাকে আমার কাছে বিড়ালের থেকেও ক্ষুদ্র মনে হয়েছে।" এই মহান আলিম তার চিন্তাভাবনা সঠিক বিষয়টির উপর সঠিকভাবে স্থাপন করেছিলেন। আল্লাহ আজ্জা ওয়া যাল প্রত্যেকের জীবনের নিয়ন্ত্রন করেন। আল্লাহ যদি ইচ্ছা না করেন তবে আপনার কিছুই হবে না।

ফারাওোহ, যে কিনা তার সময়কার সবচেয়ে শক্তিশালী জালিম ছিল, যার সাথে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনী, সবচেয়ে সেরা গোয়েন্দা সংস্থা, সবচেয়ে সমৃদ্ধ পুলিশ ফোর্স; বানি ইসরাইলের একজন ব্যক্তিও এদের বিরুদ্ধে লড়াই তো করতেই পারতো না বরং তাদের কাছে এর আগেই তথ্য পৌঁছে যেতো। তার কাছে এই তথ্যও পৌঁছে গিয়েছিলো যে বানি ইসরাইলের এক সন্তান তার রাজ্য কেড়ে নিবে। আপনারা মুসা আর ফিরাউনের কাহিনী জানেন। ফারাওোহ স্বপ্নে দেখলো যে কেউ তাকে বলল যে ইয়াহুদিদের মধ্যে এমন একজন রয়েছে যে তার কাছ থেকে তার রাজ্য ছিনিয়ে নিবে। তাই ফিরাউন সেই বছরে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেক ছেলে সন্তানকে হত্যা করে। বানি ইসরাইলের প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলাকে সে নজরদারিতে রাখতো। যদি দেখা যেতো যে সন্তান ছেলে হয়েছে, তবে তাকে শেষ করে দেওয়া হতো; আর যদি সন্তান মেয়ে হতো তবে তাকে ছেড়ে দেওয়া হতো। কিন্তু এর পড়েও মুসা (আঃ) এর মা তার গর্ভাবস্থা তাদের থেকে আড়াল করে রাখতে আর তাকে নিরাপদে জন্ম দিতে আল্লাহর ইচ্ছায় সক্ষম হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এই শিশু মুসা ফেরাউনের কাছেই পরবর্তীতে লালিত পালিত ও বড় হয়। আল্লাহ মুসা (আঃ) এর মাকে আদেশ করেছিলেন তার সন্তানকে পানিতে ছেড়ে দিতে। চিন্তা করে দেখেন, আল্লাহ একজন মাকে আদেশ করছেন তার বাচ্চাকে পানিতে ছেড়ে দিতে। আল্লাহর আদেশে তিনি মুসাকে একটি ছোট্ট বক্সে করে পানিতে ছেড়ে দেন আর শিশু মুসা ফিরাউনের প্রাসাদের সামনে পৌঁছে যান। ফিরাউন এই বাচ্চা গ্রহণ করলো, তাকে বড় করলো। আল্লাহ বলেন,

"অতঃপর ফিরাউনের লোকজন তাকে (শিশু মুসাকে) উঠিয়ে নিল। এর পরিনাম তো এই ছিল যে সে (শিশু মুসা) তাদের শত্রু ও দুঃখের কারন হবে।" {সূরা আল কাসাস, ২৮ : ৮}

এটি হল আল্লাহর নামের একটি শিক্ষা, তিনি হলেন আল ওয়ালিই অর্থাৎ অভিভাবক। আল্লাহ যদি তার কোন গোলামকে রক্ষা করতে চান তবে যত বড় সুপার পাওয়ারই হোক না কেন, তার যতই শক্তিশালী অস্ত্র বা সেনাবাহিনী বা গোয়েন্দা

সংস্থাই থাকুক না কেন, এমনকি তারা যদি বিশ্বের সকল জাতির সহযোগিতা গ্রহণও করে, তবে কেউই তার সেই গোলামের সামান্য ক্ষতিও করতে পারবে না। আর তারা তাদের সময়কার ফিরাউনদেরকে উত্যক্ত করেই যেতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আল্লাহ এদের জীবনগুলো কেড়ে নেন।

মুসা (আঃ) ফিরাউনের কাছে এসে তাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার আহবান করলেন। কিন্তু ফিরাউন কিভাবে সেই সময় মুসা (আঃ) কে হত্যা করতে সক্ষম হলেন না ? মুসা (আঃ) এর সাথে কি কোন সেনাবাহিনী ছিল ? না, বরং তার সাথে ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কতবার হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিলো ? তিনি তো মক্কায় ছিলেন একা, তার তেমন একটা সমর্থন ছিল না। আর মক্কা ছিল আইনবিহীন একটা জায়গা, কোন একজন ব্যক্তি তার কাছে এসে সহজেই তাকে হত্যা করতে পারতো। কিন্তু আল্লাহ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে রক্ষা করতে চাইলেন।

আর প্যালেস্টাইনে যা ঘটছে সেখানে আমাদের জন্য শিক্ষা আছে। আমরা দেখছি যে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনী কিছু নিরস্ত্র নেতাদের হত্যা করতে চাচ্ছে। তারা তাদের কাজ শেষে নিরাপদে বের হয়ে যায় অথচ অন্যদিকে ভীরু ও কাপুরুষ মুসলিমেরা লাখে লাখে মারা যায় ! কিন্তু যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় আল্লাহ তাদের রক্ষা করেন। সুতরাং পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে এই ব্যাপারগুলো চিন্তা করবেন না। চিন্তা করার সময় সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক বিষয়টির উপর চিন্তাকে রেখে এরপর চিন্তা করুন। আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিন নিয়ন্ত্রন করেন। আপনার শরীরে একটি সুঁইয়ের খোঁচাও লাগবে না যদি না আল্লাহ সেটা আপনার তাকদিরে লিপিবদ্ধ না করে দেন। আপনি মৃত্যু থেকে পালিয়ে বেড়াতে চাচ্ছেন কিন্তু মৃত্যু তো আপনাকে ঠিকই খুঁজে নিবে। আল্লাহ বলেন,

"তুমি কি (তাদের পরিনতি) দেখোনি যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলো ..." {সূরা আল বাকারাহ, ২ : ২৪৩} ,

এই আয়াতে বানি ইসরাইলের কিছু লোকের ব্যাপারে বলা হয়েছে যারা মৃত্যু থেকে পালিয়ে যেতে চাইছিলো। আল্লাহ তাদের প্রতি মৃত্যু পাঠিয়ে দিলেন।

খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রাঃ) জিহাদের মাঠে শহীদ হওয়ার জন্য কত চেষ্টাই না করলেন, যখন তিনি মৃত্যুমুখে মালাকুল মাউতকে দেখলেন তখন বললেন, "আমি তো প্রত্যেকটি জিহাদেই শহীদ হওয়ার জন্য চেস্টা করেছিলাম আর আমার শরীরে এমন এক ইঞ্চি জায়গা নেই যেখানে কোন আমি কোন আঘাত পাইনি – সেটা হোক তরবারির আঘাত বা তীর বর্শার আঘাত, আর আজ আমি এখানে আমার এই বিছানাতেই মারা যাচ্ছি। সুতরাং ভীরু লোকদের চোখ যেন না ঘুমায়, আল্লাহ যেন ভীরু লোকদের চোখ থেকে তাদের ঘুম কেড়ে নেন।" তিনি বললেন যে, তোমরা মৃত্যু থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছ আর আমি মৃত্যুর সন্ধানে এত চেষ্টার পরও এর মুখোমুখি হলাম না। খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রাঃ) এর বিছানায় মৃত্যুর পিছনে অবশ্যই একটি কারন আছে। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে তিনি হলেন আল্লাহর তরবারি। তাই এই ব্যাপারটি খুবই বেমানান যে আল্লাহর তরবারি খেতাবপ্রাপ্ত এক সাহাবীকে কাফিররা জিহাদের মাঠেই হত্যা করবে আর একজন আল্লাহর তরবারির এরকম মৃত্যুই দরকার যা তার ক্ষেত্রে হয়েছিলো। কিন্তু এটা অন্য ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও হতে পারে তবে সেটা অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে সুরক্ষা দেওয়া না দেওয়ার উপর নির্ভর করে।

আপনারা লক্ষ্য করুন বর্তমান সময়কার লোকদের দিকে। আপনারা লক্ষ্য করুন বর্তমানে কি ঘটছে। এমন কিছু ব্যক্তি আছেন যাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করছেন। আপনি জানেন না সেটা কিভাবে, কিন্তু আসল কথা হল এই যে নিরাপত্তা তো একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। আল্লাহ হলেন হিফাজতকারি, তিনিই আমাদের রক্ষাকর্তা।

আসমানসমূহ ও জমিনের সব কিছুর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর হাতে। আর এটার প্রতি যদি আপনার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে তবে আপনি কখনোই হারাম রিযক খোঁজ করবেন না। আপনি হারাম রিযকের পিছে ছুটবেন না কারন আপনি তো এটা বিশ্বাস করেনই যে আপনার রিযক অনেক আগে থেকেই নির্ধারিত করা আছে, সেটা আপনার কাছে আসা হল সময়ের ব্যাপার মাত্র। আল্লাহ বলেন,

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য (সংকট থেকে বের হয়ে আসার) একটা পথ তৈরি করে দেন, এবং তিনি তাকে এমন রিযক দান করেন যার (উৎস) সম্পর্কে তার ধারনাই নেই .... . " {সূরা আত তালাক, ৬৫ : ২-৩}

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করবে আল্লাহ তার জন্য একটি পথ তৈরি করে দিবেন আর তাকে এমন স্থান থেকে রিযক দান করবেন যা সে আশাই করে না। সুতরাং, আমরা এতক্ষন আয়াতুল কুরসির যে আয়াতাংশ নিয়ে আলোচনা করলাম এর উপর বিশ্বাস করা আর ইয়াকিন করার অনেক ধরণের অর্থ ও সেগুলোর প্রভাব রয়েছে।

مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ

অর্থঃ এমন কে আছে যে তার দরবারে বিনা অনুমতিতে শাফাআত করবে ?

আমরা শাফাআতে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি যে একমাত্র মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে শাফাআতের অনুমতি দেওয়া হবে। আর এরপর বিশেষ ব্যক্তিদের শাফাআতের অনুমতি দেওয়া হবে, যেমন আল্লাহর অনুমতিতে শহীদরা শাফাআত করতে পারবে। কিন্তু মোট কথা হল এই যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউই শাফাআত করতে পারবে না। আহলে কিতাবদের লোকদের মধ্যে একটা বিশ্বাস আছে যে তাদের মহৎ ব্যক্তিরা, পন্ডিত ব্যক্তিরা, তাদের কিতাবের শিক্ষকরা বিচার দিবসে শাফাআত করতে পারবে। তাই আল্লাহ তাদের জবাব দিলেন যে শাফাআত করাটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মর্জির উপর নির্ভর করে না। সুতরাং শাফাআত ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত আল্লাহ অনুমতি দান করেন।

এই আয়াত থেকে আমরা এটাও জানতে পারি যে আমাদের এমনটি কখনো বিশ্বাস করা উচিত হবে না যে অমুক মানুষের অধিকার আছে আমাদের জন্য শাফাআত করার। শাফাআত হল পুরোপুরি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন যে এমন অনেক লোক আছে যারা বিশ্বাস করে যে আল্লাহর অমুক ওলী বা আউলিয়া শাফাআতের ক্ষমতা রাখে আর তাদের জন্য শাফাআত করতে পারবে। সুতরাং মোট কথা হল এই যে, শাফাআত হল এমন একটি ব্যাপার যা পুরোপুরি আল্লাহ নিয়ন্ত্রন করেন, তার অনুমতি ছাড়া কেউই শাফাআত করতে পারবে না আর তিনি যাকে ইচ্ছা শাফাআতের অনুমতি দিবেন।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ

অর্থঃ তিনি তোমাদের সামনের পিছনের সব কিছুই জানেন

আমাদের জীবন একটি লাইন অনুসারে চলে। সময় হল রৈখিক। আমাদের রয়েছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। এটাই হল সময়। সুতরাং সময় আপনার পিছনে, আপনার সাথে আর আপনার সামনে আছে। আমরা এই সামনের পথেই যেতে বাধ্য, আমরা এক কদমও পিছাতে বা এগুতে পারবো না। তাই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় অতীতে ফিরে যাওয়া বা ভবিষ্যত ভ্রমণ। বরং আমরা সময়ের এই রৈখিক রেখাটি অনুসরণ করতে বাধ্য। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল্লাহ সময় দ্বারা আবদ্ধ নন কারন তিনিই এটা সৃষ্টি করেছেন। এর সবই আল্লাহর সম্মুখে রয়েছে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ - সবই তার জ্ঞানে রয়েছে। আল্লাহ অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবই একইভাবে জানেন, এতে কোন ভিন্নতা নেই। আল্লাহ আপনার সম্মুখ ও পশ্চাতের সবই জানেন।

আল্লাহ তার কিছু আম্বিয়াকে ভবিষ্যতের এক ঝলক দেখিয়েছিলেন। কেন ? কারন আল্লাহর সামনে তো এগুলো উন্মুক্ত বইয়ের মত। আল্লাহ তার রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ভবিষ্যতের অনেক কিছুই দেখিয়েছেন আর সেগুলো রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু) তার সাহাবীদের জানিয়েও দিয়েছিলেন - বিচার দিবসের ঘটনা, জান্নাতে কোন একটা ঘটনা ঘটা, দোজখের কোন একটা ঘটনা ইত্যাদি - রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আসল দৃশ্যই দেখেছিলেন কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় তাকে (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) ভবিষ্যৎ দৃশ্যগুলো আগেই দেখান হল যে ভবিষ্যতের বিভিন্ন সময়ে কি কি ঘটবে। আল্লাহ এর সবই জানেন কারন সবই তার সামনে উন্মুক্ত। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ

অর্থঃ তার জানা বিষয়সমূহের কোন কিছুই (তার সৃষ্টির) কারো জ্ঞানের সীমা পরিসীমার আয়ত্তাধীন হতে পারে না, তবে কিছু জ্ঞান যদি তিনি কাউকে দান করেন (তবে সেটা ভিন্ন কথা)

আমাদের জ্ঞান আল্লাহর কাছ থেকেই আসে। একবার বানি ইসরাইলের এক ব্যক্তি মুসা (আঃ) কে জিজ্ঞেস করলো, "হে মুসা, সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি কে ?" মুসা (আঃ) বললেন, "আমি।" মুসা (আঃ) কিন্তু কোনরকম অহংকার থেকে এ কথা বলেননি। মুসা (আঃ) তার জ্ঞানে সবচেয়ে ভালো যে জবাব জানা ছিল সেটাই বলেছিলেন। তিনি জানতেন যে তিনিই সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি ছিলেন আল্লাহর নবী ও রসূল, জিবরাঈল তার সাথে কথা বলতেন, তিনি আল্লাহর ওয়াহি লাভ করতেন, তাই তিনি কোন সংশয় ছাড়াই মনে করতেন যে তিনিই সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী। কিন্তু আল্লাহ তাকে জানিয়ে দিলেন যে এমন একজন আছেন, তার যে জ্ঞান আছে মুসা (আঃ) এর তা নেই। তখন মুসা (আঃ) কি করলেন ? আগেই বলেছিলাম যে তিনি কোন রকমের অহংকার থেকে জবাবটি দেন নি। তিনি আল্লাহর কাছে জানতে চাইলেন যে তিনি সেই ব্যক্তিকে কোথায় পাবেন। মুসা (আঃ) আল্লাহ্‌কে এটাও বলে দিলেন যে তিনি সেই জ্ঞানী ব্যক্তির অধীনে শিক্ষা লাভ করতে চান। সুতরাং, মুসা (আঃ) একজন নবী ও রসূল হয়েও এই ব্যক্তির কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্য সফরের ইচ্ছা করেছিলেন।

আমাদের এই বর্তমান সময়ে ইলম ছড়িয়ে রয়েছে যা কিনা আমাদের বিনামূল্যেই দেওয়া হচ্ছে আর আমরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি, মনে রাখবেন যে মুসা (আঃ) সেই আগেরকার দিনে দীর্ঘ সফর করেছিলেন সেই ইলমের জন্য আর

তিনি ছিলেন একজন নবী ও রসূল যার কিনা সত্যিকার অর্থে কোথাও গিয়ে কারো কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করা প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু তিনি এটা করলেন কারন তিনি ইলম অর্জন করা ভালবাসতেন।

তিনি গিয়ে খিযর (আঃ) এর সাথে দেখা করলেন। একটি সনদে বর্ণিত আছে যে একটি পাথরের কাছে গিয়ে মুসা (আঃ) থেমে যান। সেখানে একটি প্রস্রোবনে একটি পাখি পানি নেওয়ার পর খিযর (আঃ) বলেন, “হে মুসা, আমার, আপনার ও সমস্ত মাখলুকের জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় ততটুকু, এই পাখিটির চঞ্চুর পানি এই সমুদ্রের তুলনায় যতটুকু।”

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ

অর্থঃ তার কুরসী আসমানসমূহ যমীনের সব কিছুই পরিবেষ্টন করে আছে

কুরসী শব্দের অর্থ হল যেখানে পা রাখা হয়। আল্লাহর কুরসী আসমানসমূহ ও যমীনের সব কিছুই পরিবেষ্টন করে আছে। সুতরাং চিন্তা করে দেখেছেন এর বিশালতা সম্পর্কে ?

আধুনিক বিজ্ঞান থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে মহাবিশ্বে কোটি কোটি তারকা আর কোটি কোটি গ্যালাক্সি আছে। আর মহাবিশ্বে এগুলোর একটি থেকে আরেকটির দূরত্ব এতই বেশী যে এক্ষেত্রে কিলোমিটার বা মাইলকে পরিমাপক হিসেবে ব্যবহার করা হয় না, বরং আলোকবর্ষ ব্যবহার করা হয়। আলোকরশ্মি প্রতি সেকেন্ডে ৩০০০০০ কিলোমিটার বা ১৮৬০০০ মাইল ভ্রমন করে। এটি তো গেলো সেকেন্ডের হিসাব, এখন চিন্তা করে দেখুন এক বছরে এই হিসেবে কি পরিমান পথ আলোকরশ্মি পাড়ি দেয়। আমাদের সবচেয়ে নিকটতম তারকা আমাদের থেকে ৪ ১/৪ আলোকবর্ষ দূরত্বে রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে আমরা যা কিছু ঘটতে দেখি তা আলোর কারনে দেখতে পাই। আমি যখন আপনাকে দেখি, প্রকৃতপক্ষে আমি আপনার শরীর থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসা আলো দেখি। সুতরাং আলো আপনার শরীরে প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখে আসছে আর এরপর আমার মস্তিস্ক এটার ব্যাখ্যা করছে। তাই আলো নিভিয়ে দিলে আমরা কেউই কাউকে দেখতে পাবো না কারন আলোর কোন প্রতিফলনই হবে না। তাই কোন কিছুর দৃশ্য প্রকৃতপক্ষে আলো বহন করে থাকে। আমি এখন আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, আপনার যে প্রতিচ্ছবি আমি দেখছি সেটা হল ক্ষণিকের জন্য কারন আলোকরশ্মি খুব দ্রুত বেগের হওয়ার কারনে তা আপনার কাছ থেকে আমার কাছে খুবই দ্রুত আসছে। কিন্তু আপনি যখন রাতে ৪ ১/৪ আলোকবর্ষের দূরত্বের কোন তারকা দেখবেন, তখন আপনি প্রকৃতপক্ষে সেই তারকার ৪ ১/৪ বছর আগের প্রতিচ্ছবি দেখছেন। অর্থাৎ আপনি সরাসরি কোন প্রতিচ্ছবি দেখছেন না। হয়তোবা সেই তারকাটি আপনার সেই দেখার মুহূর্তে সেই স্থানে সেই অবস্থায় নাও থাকতে পারে কিন্তু এরপরও সেটা সেই স্থানে আকাশে দেখতে পাচ্ছেন। এখন সেই সকল তারকার কথা চিন্তা করেন যেগুলো আমাদের থেকে হাজার হাজার, লাখ লাখ, কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে, আমরা আসলে এই তারকাগুলোকে সরাসরি বর্তমান অবস্থায় দেখতে পাই না, বরং সেগুলো হল এদের পুরনো প্রতিচ্ছবি (আলোকবর্ষ অনুযায়ী)। ঠিক তেমনিভাবে আপনি যে মহাবিশ্ব দেখছেন প্রকৃতপক্ষে আপনি এই মহাবিশ্বের পুরনো প্রতিচ্ছবি দেখছেন, আমরা কেউই জানি না যে সেখানে কি হয়েছিলো। এখন আমরা মনে করছি যে টেলিস্কোপ আমাদের সবই বলে দিচ্ছে কিন্তু আমরা যা দেখছি তা সবই পুরনো দৃশ্য। ইয়াওমুল কিয়ামাহ তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলছে আর আমরা জানি না সেটা কখন হতে যাচ্ছে, সেটা জানাটা কখনো সম্ভবও নয়।

সুতরাং রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন বললেন যে ইয়াউমুল কিয়ামাহ খুবই নিকটে, তাই হয়তোবা সেই সময় বিচার দিবসের শুরু তখনই ঘটে গিয়েছিলো। কিন্তু সেটা আমাদের জানার উপায় নেই বরং আমাদের এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা শুরু করতে হবে সেটা যখনই আসুক না কেন।

যাই হোক, এই তারকাগুলো কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করলেও আমরা এখনও প্রতিদিনই নতুন নতুন গ্যালাক্সি আবিস্কার করছি। আল্লাহ বলেনঃ

"এবং নিশ্চয়ই আমরা নিকটবর্তী আসমানকে প্রদীপমালা দিয়ে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছি . . " {সূরা আল মূলক, ৬৭ : ৫}

সুতরাং এর অর্থ হল আমরা যা কিছুই দেখছি তা হল নিকটবর্তী অর্থাৎ সর্বনিন্ম আসমানের দৃশ্য। এই একবিংশ শতাব্দীতেও আমরা সর্বনিন্ম আসমান অতিক্রম করতে ব্যর্থ আর আমরা এক্ষেত্রে দূরত্ব পরিমাপ করে জ্যোতির্বিদ্যা সংখ্যানুসারে, আলোকবর্ষ হিসেবে। কিন্তু রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে সপ্তম আসমান আর এর উপরের আসমানের উদাহারন হল কোন ঢালের উপর পড়ে থাকা একটি আংটির মত। অর্থাৎ আকৃতির অনুপাত হল একটি আংটি একটি ঢালের উপর থাকলে যে অনুপাত হয় সেটা। সুতরাং আমরা যেখানে আমাদের সপ্তম আসমানের আকারের কোন কুলকিনারা করতে পারলামই না সেখানে আপনারা এই সপ্তম আসমানকে আংটির আকৃতির ধরে আর ষষ্ঠ আসমানকে ঢাল আকৃতির ধরে ব্যাপারটা বুঝার চেষ্টা করে দেখুন। এমনিভাবে ষষ্ঠ আসমান পঞ্চম আসমানের তুলনায় একটি আংটি যেখানে পঞ্চম আসমান যেন একটি ঢাল, পঞ্চম আসমান চতুর্থ আসমানের তুলনায় একটি আংটি যেখানে চতুর্থ আসমান যেন একটি ঢাল, চতুর্থ আসমান তৃতীয় আসমানের তুলনায় একটি আংটি যেখানে তৃতীয় আসমান যেন একটি ঢাল, তৃতীয় আসমান দ্বিতীয় আসমানের তুলনায় একটি আংটি যেখানে দ্বিতীয় আসমান যেন একটি ঢাল, দ্বিতীয় আসমান প্রথম আসমানের তুলনায় একটি আংটি যেখানে প্রথম আসমান যেন একটি ঢাল; আর সপ্তম বা প্রথম আসমানের সাথে আল্লাহর সেই কুরসির সাথে তুলনা হল মরুভূমিতে পড়ে থাকা একটি আংটির ন্যায়! আল্লাহ এই আয়াতাংশে তাই বলেছেন যে আল্লাহর কুরসী আসমানসমূহ ও যমিনের সবই পরিবেষ্টন করে আছে।

আর দুর্বল মানুষেরা মনে করে যে তারা আল্লাহর কাছ থেকে পালাতে পারবে! আপনি কে? আপনি তো ছোট্ট একটি গ্রহে বাস করছেন, আপনি মহাবিশ্বের একটি কাল্পনিক দৃশ্য কল্পনা করলেও এটি দেখতে সক্ষম হবেন না। আপনি তো কিছুই না। আপনি যখন কোন গ্যালাক্সির দিকে তাকান, তখন আপনি তো গ্যালাক্সির এক কোনায় মহাবিশ্বের কোন এক প্রান্তে নিক্ষিপ্ত হোন। আমরা কিছুই না।

আল্লাহ বলেছেনঃ

"অতএব তোমরা আল্লাহর দিকেই ধাবিত হও" {সূরা আয যারিয়াত, ৫১ : ৫০}

আল্লাহ্‌কে ভয় পাওয়ার ব্যাপারটি হল অন্য যে কোন কিছুকে ভয় পাওয়া থেকে ভিন্ন। আপনি যখন সিংহ দেখে ভয় পাবেন তখন কি করবেন ? পালিয়ে যাবেন। এমন কি কোন মানুষ দেখেছেন যে সিংহ দেখে ভয় পেয়ে উল্টো সিংহের দিকে ছুটে যাবে ? এই অবস্থায় আপনার কি করা উচিত ? যত দ্রুত সম্ভব ওই স্থান থেকে পালিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে, আপনি কোথায় পালিয়ে যাবেন ? এমন কি কোন স্থান আছে যেখানে আপনি পালিয়ে গিয়ে লুকোবেন ? না, বরং একমাত্র উপায় হল তার দিকে দৌড়ে যাওয়া। সুতরাং আল্লাহ্‌কে আপনি যখন ভয় করবেন তখন আল্লাহ থেকে পালিয়ে যেতে চাবেন না বরং তার দিকে দৌড়ে যাবেন।

আর এটাই হল আল্লাহ্‌কে ভয় পাওয়া আর অন্য কিছুকে ভয় পাওয়ার মধ্যে পার্থক্য। তাই আল্লাহ্‌কে ভয় পাওয়া হল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের ভয়। এটি এমন এক ভয় যার ফলে আপনি আল্লাহর নিকটবর্তী হবেন, তার থেকে দূরে সরে যাবেন না।

ভয় পাওয়া হল মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। আপনারও অবশ্যই ভয় আছে। কিন্তু ইসলাম এসে প্রত্যেকটি সহজাত প্রবৃত্তিকে সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহারের উপায় দেখিয়ে দিলো। আপনার লোভও রয়েছে। ইসলাম আপনাকে বলে আপনার লোভ যেন হয় জান্নাতের সুখ লাভের জন্য। আপনার মধ্যে ভয় রয়েছে। ঠিক আছে, কিন্তু সেই ভয় আপনি আল্লাহ্‌কে ভয় পাওয়ার কাজে লাগান, তবে যেন আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি যেন ভয় না করেন। আপনি ধন সম্পদ ভালবাসেন। কোন সমস্যাই নেই, ভালবাসেন, কিন্তু জান্নাতের ধন সম্পদ ভালবাসেন। আপনি যা করতে সক্ষম নন ইসলাম আপনাকে তা করতে বলে না। আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ কখনোই কাউকে তার শক্তি সামর্থ্যের বাইরে কোন কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না" {সূরা আল বাকারাহ, ২ : ২৮৬}

ইসলাম আপনার সকল প্রয়োজনই পূর্ণ করে দিবে আর এর থেকেও বেশী দিবে, আপনি যা চান তাই পাবেন আর আল্লাহর তরফ থেকে আরও অধিক দেওয়া হবে যেমনটা আল্লাহ কুরআনে বলেছেন।

وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ

অর্থঃ এ উভয়টির হেফাজত করার কাজ কখনো তাকে পরিশ্রান্ত করে না।

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

অর্থঃ তিনি সবচেয়ে মর্যাদাবান ও সবচেয়ে মহান।

আয়াতুল কুরসী শুরু হয়েছে আল্লাহর দুটি নাম দিয়ে - আল হাই, আল কাইয়ুম; আর এই আয়াত শেষ হয়েছে তার আরও দুটো নাম দিয়ে - আল 'আলিই, আল 'আযিম। সুতরাং আপনি যখন উচ্চারন করবেন যে আল্লাহ মহান, আপনি সাধারনভাবে হয়তোবা চিন্তা করবেন যে সেটা তো আপনি জানেনই। আল্লাহর নামগুলোর প্রতি সাধারনভাবে চিন্তাভাবনা করার পথটি ছেড়ে দিয়ে তার নামের ব্যাপারে আমাদের উচিত গভীরভাবে চিন্তাভাবন্তা করা। আপনি যখন বলবেন যে আল্লাহ হলেন আল আযিম (সবচেয়ে মহান), যার অর্থ হল আল্লাহ যে কোন কিছু থেকে মহান, তিনি যেকোন কিছু থেকে বড়। আল্লাহ আপনার পরিবার থেকে বড়, আপনার ধন সম্পদ থেকে বড়, আপনার নিজের জীবন থেকে বড়, আপনার চাকরী থেকেও বড়। তিনি যে কোন কিছু থেকে বড় ও মহান।

তাই আপনি যখন সালাতে আল্লাহু আকবর বলবেন যেটারও অর্থ হল আল্লাহ মহান, এটা বলার মাধ্যমে আপনি সব কিছু আপনার পিছনে নিক্ষেপ করলেন। আর সেই সময়টুকু আপনি একান্তভাবে আল্লাহকেই দিবেন। আল্লাহ মহান। আপনি যখন সালাতে তাকবীরের জন্য আপনার হাত দুটো উঠাবেন, সব কিছু পিছনে ফেলে দিবেন।

এটাই হল আয়াতুল কুরসীর তাফসীর। এই তাফসীর বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি কাহিনীর মাধ্যমে সমাপ্ত করতে চাচ্ছি।

আবু হুরায়রা (রাঃ) কে রামাদানের যাকাত (সাদাকাতুল ফিতর) পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো। তিনি পাহারা দিচ্ছেন, এমন সময় একজন আগমনকারী এসে আঁজলা ভরে খাবার নিতে লাগলো। তিনি এই আগমনকারীকে আটক করে বললেন যে তাকে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে পেশ করবেন। সেই ব্যক্তি উনাকে বলল যে সে একজন সত্যিকারের অভাবী, পরিবারের ভরন পোষণের দায়িত্ব তার উপর। তো আবু হুরায়রা (রাঃ) ছিলেন খুব দয়ালু মনের সাহাবী, তাই তিনি এই লোককে ছেড়ে দিলেন। সকালে তিনি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট হাজির হলে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাঃ) কে বললেন, "হে আবু হুরায়রা, গত রাতে তোমার বন্দী কি আচরন করেছে?" আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, "সে তার অভাব ও (অসহায়) পরিবার সন্তানের অভিযোগ জানালো। তাই তার প্রতি আমার দয়া হওয়ার কারনে আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি।" রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "সতর্ক থেকো, সে আবার আসবে।" সুতরাং আবু হুরায়রা (রাঃ) রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একথা শুনে নিশ্চিত হলেন যে সেই চোর আবার আসবে। তাই তিনি সেই চোরের অপেক্ষায় থাকলেন।

সেই একই চোর আবারও সেখান থেকে আঁজলা ভরে খাবার নিতে লাগলো। তিনি আবার তাকে আটক করে বললেন, "আমি তোমাকে অবশ্যই রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে পেশ করবেন।" সে আবারও একই কথা বলে তাকে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানালো। আবু হুরায়রা (রাঃ) এর মনে আবারও দয়া হল, তাই তিনি এবারও ছেড়ে দিলেন। সকালে তিনি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট হাজির হলে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাঃ) কে বললেন, "হে আবু হুরায়রা, গত রাতে তোমার বন্দী কি আচরন করেছে?" আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, "সে তার অভাব ও (অসহায়) পরিবার সন্তানের অভিযোগ জানালো। তাই তার প্রতি আমার দয়া হওয়ার কারনে আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি।" রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "সতর্ক থেকো, সে আবার আসবে।" সুতরাং তৃতীয় রাতেও আবু হুরায়রা (রাঃ) এই চোরের অপেক্ষায় রইলেন।

সেই চোর তৃতীয়বারের মত এসে আঁজলা ভরে খাবার চুরি করে নিতে লাগলো, আবু হুরায়রা (রাঃ) তাকে তৃতীয়বারের মত আটক করে বললেন, "এবার তোমাকে অবশ্যই রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে হাজির করব। এটা তিনবারের মধ্যে শেষবার।" সুতরাং চোর যখন বুঝতে পারলো যে পরিস্থিতি খারাপ দিকে এগুচ্ছে তখন সে বলল, "আপনি আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে এমন কিছু শব্দ শিখিয়ে দিব যার দ্বারা আল্লাহ আপনার উপকার করবেন।"

এই চোর খুব ভালো করেই আবু হুরায়রা (রাঃ) এর দুর্বলতা সম্পর্কে জানতো, আবু হুরায়রা (রাঃ) এর দুর্বলতা ছিল এই যে তিনি ইলম খুবই ভালোবাসতেন। তিনি ছিলেন একজন ইলম অন্বেষণকারী। তিনি ইলম অর্জন করা এত বেশী পছন্দ করতেন যে তিনি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটে অধিকাংশ সময় পার করতেন। বানু উমাইয়ার সময়কালে কিছু লোক আবু হুরায়রা (রাঃ) এর নিকটে এসে তাকে জিজ্ঞেস করলো, "কিভাবে আপনি এত বেশী সংখ্যক হাদিস বর্ণনা করেন অথচ অন্যান্য সাহাবীরা আপনার মত এত বেশী হাদিস বর্ণনা করেন না ?" এটা মনে রাখবেন যে আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রথম দিকের মুসলিমদের মধ্যে ছিলেন না, তিনি খন্দক বা খায়বার যুদ্ধের পর মুসলিম হোন। যাই হোক, আবু হুরায়রা (রাঃ) তাদেরকে বললেন, "অন্যান্য সাহাবীদের ব্যবসা ও খামার ছিল। আমি শুন্য পেটে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অনুসরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। সাহাবীরা যখন তাদের ব্যবসা বাণিজ্য, দোকান আর খামার নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, আমার তখন কোন ব্যবসা বা কোন কাজই ছিল না আর তখন আমি রসুলুল্লাহ

(সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে খাবার শুন্য পেটে অনুসরণ করতাম।" এই মহান সাহাবী ইলম অর্জন খুবই ভালোবাসতেন। তিনি ছিলেন হাদিসের একজন ছাত্র।

তো যা বলছিলাম, সেই চোরটি আবু হুরায়রা (রাঃ)'র হাত থেকে কিভাবে ছাড়া পাওয়া যায় সেটা জানতো, তাই সে উনাকে এমন কিছু শব্দ শেখানোর কথা বলল। আবু হুরায়রা (রাঃ) রাজি হলেন। সেই লোকটি বলল, "আপনি যখন ঘুমোতে যাবেন, তখন আয়াতুল কুরসী পুরোটা তিলাওয়াত করবেন। এটা করলে আল্লাহ আপনার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত করে দিবেন যিনি আপনার সাথে থাকবেন আর সকাল পর্যন্ত কোন শয়তান আপনার নিকটে আসতে পারবে না।" আবু হুরায়রা (রাঃ) তাকে ছেড়ে দিলেন। সকালে আবু হুরায়রা (রাঃ) রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আগমনকারী সম্পর্কে জানতে চাইলে আবু হুরায়রা (রাঃ) রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ঘটনা খুলে বললেন। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "ইয়া আবা হুরায়রা, তুমি কি জান গত তিন রাত তুমি কার সাথে কথা বলেছো ?" আবু হুরায়রা (রাঃ) জবাব দিলেন যে তিনি জানেন না। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "সে ছিল শয়তান।"

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, এর দ্বারা আপনাদেরকে শয়তানকে অনুসরনের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না, বরং এটা ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম। এখান থেকে আমরা শয়তানের সেই নাসিহাহ (উপদেশ) নিতে পারি কিন্তু মনে রাখতে হবে যে শয়তান সেটা আমাদের জানালো এ কারনে না যে সে আমাদের ভালোবাসে। বরং সে আবু হুরায়রা (রাঃ) এর কাছে ধরা খেয়ে ভয়াবহ বিপদের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলো তাই সে তার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এটা বলেছে। শয়তানের থেকে এমন অভিজ্ঞ কেউই নেই যে কিনা আপনাকে রাতে আয়াতুল কুরসী তিলাওয়াতের মূল্য বুঝাতে পারবে কারন শয়তানই হল সে, যে কিনা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। সে তার অভিজ্ঞতা থেকেই কথাটা বলেছে। এই আয়াত তার জন্য খুবই কষ্টদায়ক। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যদিও সে একজন মিথ্যাবাদী কিন্তু সে তোমাকে সত্যই বলেছে।" তাই শয়তান সেই সময়টাতে বিপদে পড়ে মিথ্যাবাদী হওয়া সত্ত্বেও সত্য বলে দিলো। তাই আপনি কেবলমাত্র এই ঘটনাতেই শয়তানের এই উপদেশ অনুসরণ করতে পারবেন, অন্য কোন ঘটনায় নয়।

তাই ঘুমোতে যাওয়ার পূর্বে আয়াতুল কুরসী তিলাওয়াত করবেন, এর ফলে সকালে ঘুম থেকে উঠার আগ পর্যন্ত আপনি শয়তান থেকে নিরাপত্তা পাবেন। আল্লাহর দেওয়া অস্ত্রভাণ্ডারের মধ্যে এটি একটি অস্ত্র যা আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন। আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতোয়ানির রজিম হল এর মধ্যে আরেকটি অস্ত্র। আল্লাহর যিকর এর মধ্যে একটি। আরও আছে সূরা ফালাক ও সূরা নাস। এগুলো আপনাকে সাহায্য করবে আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু, অভিশপ্ত শয়তান ইবলিসের বিরুদ্ধে। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "তুমি যদি প্রত্যেক সালাতের পর আয়াতুল কুরসী তিলাওয়াত করো তবে তোমার আর জান্নাতের মাঝে মৃত্যু ছাড়া কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।" তাই প্রত্যেক সালাতের পর আয়াতুল কুরসী তিলাওয়াত করুন।

আয়াতুল কুরসী হল এমন এক আয়াত যেটা কিনা ফজরের সালাতের পর থেকে রাতে তিলাওয়াত করার আগে সারাটা সময় আপনার সাথে করে রাখা উচিত। আমি বলছি না যে আপনি এই আয়াত কোন কাগজের উপর লিখে আপনার সাথে রাখবেন বরং বলতে চাচ্ছি এই আয়াত আপনার অন্তরে রাখবেন।

আমরা আল্লাহর কাছে দুয়া করছি যে তিনি যেন আমাদের ক্ষমা করেন, আমরা তার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি দোযখ থেকে এবং দুয়া করছি যেন তিনি আমাদেরকে জান্নাত দিয়ে পুরস্কৃত করেন। আমীন, আল্লাহুম্মা আমীন।

সাল্লাল্লাহু আ'লা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়াসহাবিহি ওয়া সাল্লাম তাসলিমান কাসিরা।


Visit Our Website
g+